গোলটেবিল আলোচনা

‘সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি আইনের প্রয়োজনীয়তা’

৩১ আগস্ট, ২০১৩ ▪ ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা ▪

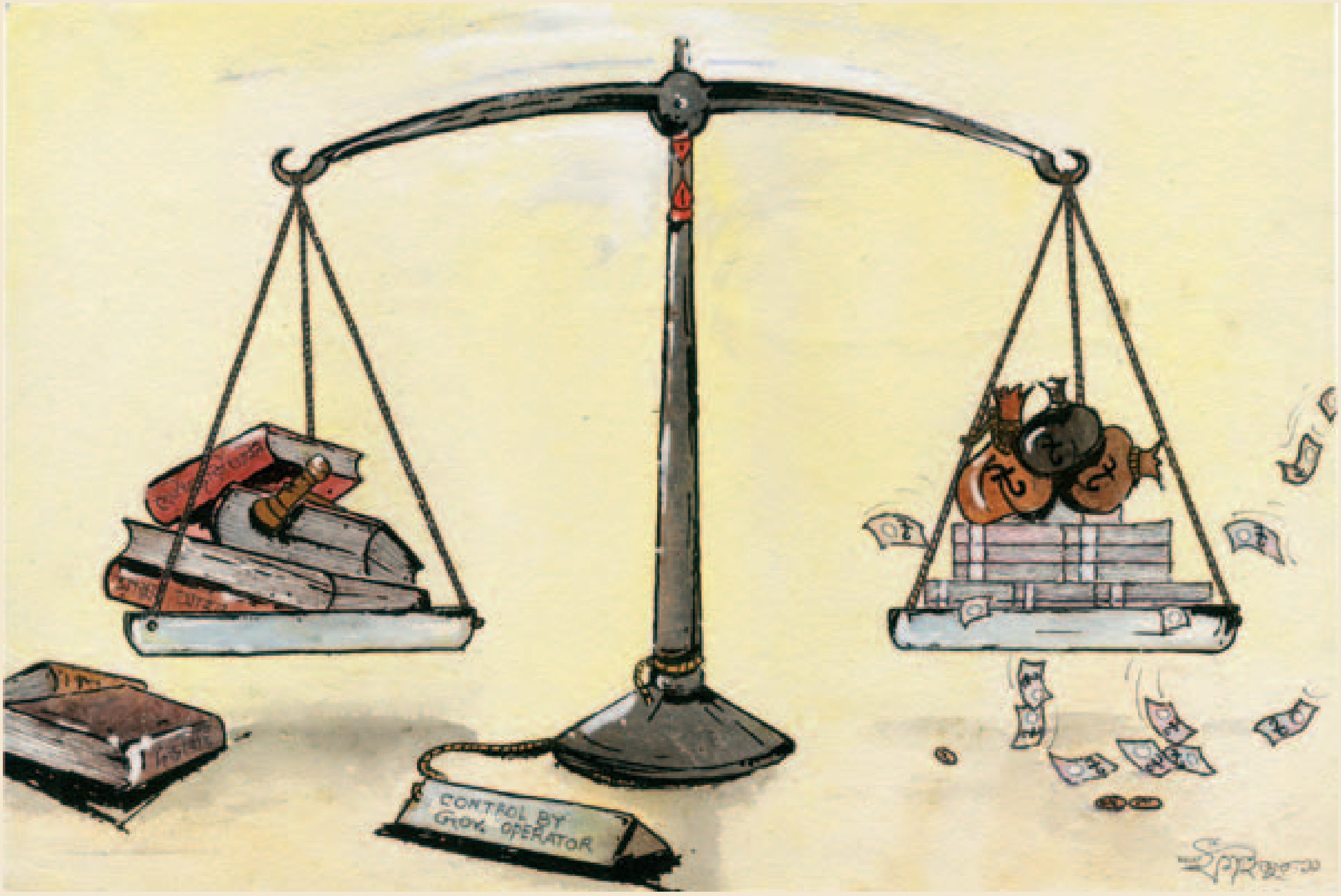

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

গোলটেবিল আলোচনা

‘সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি আইনের প্রয়োজনীয়তা’

৩১ আগষ্ট, ২০১৩ ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১৩
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত গোলটেবিল আলোচনায় উত্থাপিত সকল মতামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব। এতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) প্রাতিষ্ঠানিক মতামতের প্রতিফলন নেই।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh

ভূমিকা

জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং দেশের উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি জনগণের নিকট জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা থাকলে সংসদ সদস্যদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের কিছু গণপরিষদ সদস্যের আচরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। কারো কারো বিরুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানীদের সঙ্গে আঁতাত, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। সে সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়দার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত একটি নির্দেশ জারি করা হয়। ওই নির্দেশের আলোকে ৬ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে ১৬ জন সদস্যকে দুর্নীতির অভিযোগে গণপরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে ২২ সেপ্টেম্বর আরও ১৯ জনের গণপরিষদ সদস্যপদ খারিজ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংসদ সদস্যদের নৈতিকতার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারা বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন যা সংষসদ সদস্য হিসেবে তাঁদের পদমর্যাদা এবং অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। এর একটি বড় কারণ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পঞ্চম সংসদে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত তো দূরের কথা, সরকারি দল ও বিরোধী দল এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটির ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। আবার, অষ্টম সংসদের স্পিকার ও প্রয়াত চিফ হুইপের বিরুদ্ধে উথাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্য এডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়ার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিটি তাঁদের

বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পায়। তা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সংসদ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করে। আবার, নবম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার শুরুতে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে ১৫ জন সংসদ সদস্য নিজেদের স্বার্থ জড়িত আছে এমন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০) এবং মিথ্যা হলফনামা দিয়ে ২০০৯ সালে ১৮ জন সংসদ সদস্যের উত্তরা আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ নেয়া (প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১০) ইত্যাদি ঘটনা ঘটলেও কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা দৃশ্যমান হয়নি।

সংসদ সদস্যদের সদাচারণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪ জানুয়ারি, ২০১০ এ জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০' শিরোনামের একটি 'বেসরকারি সদস্যদের বিল' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটিতে ১৫টি ধারা রয়েছে, যেগুলো হলো-

ধারা ১: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম;
ধারা ২: সংজ্ঞা;
ধারা ৩: সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান;
ধারা ৪: সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব;
ধারা ৫: স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য;
ধারা ৬: ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান;
ধারা ৭: উপঢৌকন বা সেবা;
ধারা ৮: সরকারি সম্পদের ব্যবহার;
ধারা ৯ : গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার;
ধারা ১০: বাক স্বাধীনতা;
ধারা ১১: সংসদ সদস্য বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করা;
ধারা ১২: পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহিষ্ণুতা;
ধারা১৩: নৈতিক কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ;
ধারা ১৪: আইন লঙ্ঘনের শাস্তি;
ধারা ১৫: নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল।

সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন খসরু, এমপি'র নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি বিলটি পর্যালোচনা করে পাশের ব্যাপারে সুপারিশ করলেও দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিনবছর পরও আইনটি প্রণয়ন করা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক বা নিজ দলীয় কর্মী লাঞ্ছনা, আইন লঙ্ঘন করে নিজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের সাথে ব্যবসা, ক্ষমতার অপব্যবহার, হত্যা, নদী ও সরকারী সম্পত্তি দখল, চাঁদাবাজি, প্রতারণা এবং টেন্ডারবাজির অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ এ প্রকাশিত টিআইবি'র এক জরিপে দেখা গেছে, ১৪৯ টি সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যদের ৯৭ শতাংশ কোন না কোনভাবে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত। এদের আবার ৫৩.৫ শতাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রেক্ষিতে গত ৩১ আগস্ট ২০১৩ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি আইনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শহিদুজ্জামান সরকার এমপি, সাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সি এম শফি সামি, সাবেক সচিব জনাব আলী ইমাম মজুমদার, সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, সাবেক মন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন, সাবেক এমপি জনাব হুমায়ুন কবির হিরু, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মো. জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক নাজমা হাসিন প্রমুখ। এছাড়া গোলটেবিল আলোচনায় গণমাধ্যমকর্মী, উন্নয়নকর্মী, আইনজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন*

মূল প্রবন্ধে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংসদ সদস্যগণ 'হাউজ অব দি পিপল' বা মহান জাতীয় সংসদের সদস্য। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। নাগরিকরা তাঁদের কাছে দায়িত্বশীল ও দৃষ্টান্তমূলক আচরণ আশা করেন। এ ছাড়াও সংসদ সদস্যগণ সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে জনগণের কাছে সংসদের এবং নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সংসদের অভ্যন্তরে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান থাকলেও সংসদের বাইরে তাদের সংযত আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো বিধিবদ্ধ আইন নেই। তাই আমরা বেসরকারি বিল হিসেবে 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' পাশের জোর দাবী জানাই। প্রতিবেশী ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সংসদ সদস্যদের জন্য সুস্পষ্ট আচরণবিধি রয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তাদের দিনবদলের সনদে এমন একটি আচরণবিধি প্রণয়নের অঙ্গীকার করে।

প্রবন্ধে আরো বলা হয়, সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান , সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব , স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য, ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান , উপঢৌকন বা সেবা, সরকারি সম্পদের ব্যবহার, গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার, বাক স্বাধীনতা, সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুলপথে চালিত করা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা, নৈতিকতা কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ, আইন লঙ্ঘনের শাস্তি, নৈতিকতা কমিটির কার্যকালসহ মোট ১৫টি ধারা আইনটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্য বিল প্রস্তাব কমিটি' প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর ২০১১ সালের মার্চ মাসে সংশোধিত আকারে বিলটি সংসদে পাশের জন্য সুপারিশ করে। সুপারিশে বিলটির ১২ ধারা বিলুপ্ত করা হয়।

প্রবন্ধে তিনি আইনটি পাশের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিলের ১২ ধারাটি পুনঃস্থাপনের দাবী জানান। একইসঙ্গে দাবী জানান, মাননীয় সংসদ সদস্যদের কার্যপরিধি সংসদীয় কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার। বিশেষত তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে উপদেষ্টার ভূমিকা ও হস্তক্ষেপের অবসান আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। বৈষম্যমূলকভাবে সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ী আমদানী ও আবাসিক এলাকায় প্লট প্রাপ্তির অবসানেরও তাগিদ দেন তিনি। প্রবন্ধে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির ইতি টানা এবং সংসদ সদস্য আচরণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে আমরা সুনির্দিষ্ট দণ্ড ১৪ ধারায় অন্তর্ভুক্তির দাবী জানানো হয়।

মুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

জনাব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এক কথা নয়। আমাদের দেশে অনেক সুন্দর আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন হয় না। আমাদের জাতীয় সংসদরে স্পিকারের হাতে সংসদ সদস্যের অসদাচরণের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে । কিন্তু বিগত সময়ে কখনোই আমাদের কোন সদস্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখিনি। যদি তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে মাননীয় স্পিকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে নতুন আচরণ বিধি আইনেরও প্রয়োজন হতো না।

*মূল প্রবন্ধ পরিশিষ্ট-১ এ দেখুন

প্রস্তাবিত আইনটিকে ‘অসম্পূর্ণ’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, অসদাচরণের অভিযোগে দণ্ড বিধানই যদি না থাকে তবে আইনটি নখ-দন্তহীন বাঘে পরিণত হবে। রাষ্ট্রের প্রশাসনের মধ্যে যদি আমরা সংসদ সদস্যদের খবরদারিত্ব বন্ধ করতে না পারি তাহলে আমাদের বেশিরভাগ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই বাধাগ্রস্থ হবে।

মো.শহিদুজ্জামান সরকার এমপি বলেন, “সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। তারপরও প্রয়োজন হলে জাতীয় ঐকমত্যের মাধ্যমে এ ধরণের একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।” তিনি আরো বলেন, আমরা যদি ভালো জনপ্রতিনিধি পেতে চাই, তাহলে আমাদের জনগণের কাছে যেতে হবে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, ভোটাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমাদেরকে গোলাপ ফোটাতে হবে, গোলাপ ফোটানোর জন্য কথা নয় কাজ করতে হবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “আমাদের জাতীয় সংসদের সদস্যরা ব্যবসার সাথে জড়িত এটা উদ্বেগের বিষয়। স্বাধীনতার পর এই হার ছিল ১৮ শতাংশ অথচ এখন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ব্যবসায়ী। তবে সকল শ্রেণী পেশার মানুষেরই রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে এবং এটা সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসা করবেন এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।” সংসদে কোরাম সংকট বা অসংসদীয় ভাষার প্রয়োগ এবং সংসদ বর্জনের বিষয়গুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, সংসদে দীর্ঘদিন আগে প্রস্তাবিত বিলটিতে সময়ের পরিক্রমায় আরো সংশোধনীর সুযোগ রয়েছে।

জনাব সি এম শফী সামি বলেন, সার্বিকভাবে আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের কিছুসংখ্যক সংসদ সদস্যের মাঝে। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সংসদ সদস্যদের সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে আচরণবিধির কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আইন প্রণয়ন করলেই হবে না এর প্রয়োগও করতে হবে। যে দেশে আমরা আইনের ন্যূনতম প্রয়োগ করতে পারি না সেদেশে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি কতটুকু কার্যকর করতে পারবো সে নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি রিকল সিস্টেম চালু করার সুপারিশ জানান। তিনি আরও বলেন, জনগণের কাছে ক্ষমতা থাকতে হবে রিকল করার।

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সবচেয়ে বড় প্রহসন হলো যারা আইন প্রণয়ন করেন তারা আইন মানেন না। আমাদের দ্বৈততা হচ্ছে আমরা যা বলি তা আমরা মানি না। এই আইনের ১৩ ধারায় যে নৈতিকতা কমিটির কথা বলা হয়েছে তা আরেকটি বড় প্রহসন। কারণ এই কমিটিকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিদের্শনা আইনে রাখা হয়নি। এই নির্দেশনা ছাড়া কমিটির ক্ষমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

টিআইবি ও সুজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবতারণার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, এ ধরণের আইন পাশ করলেও আমরা আমাদের প্রত্যাশিত সংসদ পাবো না, যতদিন না পর্যন্ত আমরা আমাদের রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে পারব। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন না এলে এ সকল আলোচনা অরণ্যে রোদনে পরিণত হবে। তিনি দল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সংসদ সদস্য হওয়ায় পূর্বশর্ত নির্ধারণের আহবান জানান। গুরুতর আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং সংসদে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য উপস্থাপন বন্ধে তিনি এ সমস্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বক্তব্য পরিশিষ্টে যোগ করার তাগিদ দেন।

পরে মুক্ত আলোচনায় সাবেক সংসদ সদস্য হুমায়ন কবির হীরু বলেন, গুরুতর আচরণবিধি লঙ্ঘনে সংবিধান সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের বহিস্কার এবং অপসারণের আইন থাকা প্রয়োজন। সংসদ সদস্যদের আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের দাবির পাশাপাশি তিনি প্রস্তাবিত আইনের ১২ নং ধারাটি সংযুক্তের জন্য গণআন্দোলনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাংবাদিক কাজী মর্তুজা বলেন, সংসদ সদস্যদের আচরণবিধির পূর্বে রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি ঠিক করা জরুরী। কারণ রাজনৈতিক দল থেকেই সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন। তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচনের পূর্বেই প্রতিযোগীদের আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের তাগিদ দেন।

এ্যাডভোকেট জাহিদ আহাম্মদ হীরু বলেন, সংসদে ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের অশালীন ও অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার রোধকল্পে নির্দিষ্ট আইন করা জরুরী। তিনি সংসদ সদস্যদের সংবিধানের আলোকে এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার অনুরোধ জানান।

অধ্যাপক নাজমা হাসিন রাজনৈতিক দলগুলোকে সৎ যোগ্য প্রার্থীকে সংসদ সদস্য পদে মনোনয়নের জন্য আহবান জানান।

এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজ আলী বলেন, সংসদ সদস্যদের স্বেচ্ছাচারিতা কমাতে সংসদে অনুপস্থিতির ন্যূনতম দিন নির্ধারণের দাবি জানান। মুক্ত আলোচনায় ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনজুর আহমদ, সাবেক মন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেনসহ গণমাধ্যমকর্মী, উন্নয়নকর্মী, আইনজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. এটিএম শামসুল হুদা বলেন, জাতীয় সংসদের 'মাদার ল' হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানেই সুস্পষ্টভাবে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে। তিনি সংসদ সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন না করে বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। বিশ্বের সব দেশে আচার-আচরণ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থদাকে। সংসদ সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন হিসেবে সংবিধানই যথেষ্ট। আইনের প্রয়োগের জন্য একটি বিধি হলেই যথেষ্ট। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে তিনি মনে করেন। সাংসদদের জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে নিয়ম ভঙ্গ করে সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যকে নীতি নির্ধারক হিসেসেব অন্তর্ভুক্ত করারও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে মাননীয় সদস্যদের একাংশের বক্তব্য, আচরণ এবং কর্মকান্ড প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় এই আইনের প্রয়োজনীয়তা, সময়োপযোগিতা ও যথার্থতা প্রতীয়মান হয়েছে। এই আলোকে অংশগ্রহণকারীগণ সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিলটি পাস করার জোর দাবি জানান। বক্তারা বলেন, এই বিলটি আইনে রূপান্তরিত হলে এর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে একদিকে সংসদ সদস্যদের নিকট জনগণের প্রত্যাশা পূরণ সহজতর হবে এবং অন্যদিকে সংসদের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এর কার্যকর প্রয়োগ মাননীয় সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশিষ্ট

১. মূল প্রবন্ধ: সংসদ সদস্য আচরণ আইনের অপরিহার্যতা- ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

২. সংসদ সদস্যগণের আচরণ নির্ধারণকল্পে আনীত বিল

সংসদ সদস্য আচরণ আইনের অপরিহার্যতা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩১ আগস্ট, ২০১৩)

আইনসভা বা সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। আর সংসদীয় গণতন্ত্রের চরিত্র এবং গুণগত মান নির্ভর করে সংসদ সদস্যদের নিজেদের গুন, মান ও আচরণের ওপর। একইভাবে সংসদের মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জনগণের আস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সংসদ সদস্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও তাঁদের সুনাম-দুর্নামের ওপর। তাই সংসদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হলে সংসদ সদস্যদের আচরণ সংযতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণেই, বিশেষত আইন প্রণেতাদের সদাচারণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সংসদ সদস্য আচরণ আইন প্রণয়ন অপরিহার্য। এর মাধ্যমে তাঁদেরকে অসদাচারণে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব।

ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো এর অপব্যবহার। বস্তুত ক্ষমতা যেখানে, অপব্যবহারও সেখানে। কারণ ক্ষমতাধররাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন। মানবিক দুর্বলতার কারণেই তা ঘটে। তাই ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেকগুলো সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। আদালত এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

সংসদীয় পদ্ধতিতেও কিছু 'চেকস' বা নিবৃত্তকরণের ব্যবস্থা থাকে। যেমন, 'সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার' সম্পর্কিত কমিটির মাধ্যমে অসদাচারণের কারণে সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সংসদ সদস্যদের অনিয়ম, অসততা ও দুর্নীতি তথা অসদাচারণ জনসম্মুখে সংসদের মর্যাদা ভুলণ্ঠিত করে, যা সংসদ অবমাননা বলে গণ্য করা হয়। প্রতিবেশী ভারতের মত অনেক রাষ্ট্রেই সংসদ অবমাননার অভিযোগে সংসদ থেকে বহিষ্কারের মত কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে নেওয়া হয়। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও অপকমের্র সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় তিন ডজন ব্যক্তির গণপরিষদের সদস্যপদ খারিজ করা হয়। এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য হলো, সংসদ সদস্যদের সদাচারণ নিশ্চিত করা।

অন্যায় আচরণের জন্য সংসদ সদস্যদের শাস্তি প্রদান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্যায় আচরণ করে শাস্তি না পেলে অন্যায়কে উৎসাহিতই করা হয়। তবে অপরাধের পর শাস্তির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো অপরাধ আগে থেকেই রোধ করা। আর এই জন্যই প্রয়োজন একটি যুগোপযুগী সংসদ সদস্য আচরণ আইন প্রণয়ন ও এর কঠোর বাস্তবায়ন। একটি যথার্থ আচরণবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকলে সংসদ সদস্যগণ অপকর্ম থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবেন বলে আশা করা যায়।

সংসদ সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত আচরণ

বহুদিনের সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার অভিজ্ঞতার আলোকে সংসদ সদস্যদের আচরণের একটি মানদন্ড ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। বৃটিশ পালার্মেন্টের 'কমিটি অন স্টান্ডার্ড ইন পাবলিক লাইফ' (Committee on Standard in Public Life) তার পঞ্চম প্রতিবেদনে সাতটি এমন 'প্রিন্সিপলস' বা নীতিমালা চিহ্নিত করেছে।[১] প্রিন্সিপলসগুলো হলো:

(১) **নিঃস্বার্থতা** (Selflessness): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের একমাত্র জনস্বার্থেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা বন্ধুদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

(২) **সত্যনিষ্ঠতা বা সাধুতা** (Integrity): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনো ধরনের আর্থিক বা অন্য ধরনের দায় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, যাতে তারা তাদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে কোনোভাবে প্রভাবিত না হন।

(৩) **বস্তুনিষ্ঠতা** (Objectivity): জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের যোগ্যতার ওপরই গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। যেমন, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ, ঠিকাদারী চুক্তি স্বাক্ষর অথবা কোনো ধরনের পুরস্কার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে।

(৪) **দায়বদ্ধতা** (Accountability): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা জনগনের কাছে দায়বদ্ধ। তাই তাদের পদের জন্য উপযুক্ত ধরনের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া আবশ্যক।

(৫) **উন্মুক্ততা** (Openness): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সকল কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা প্রদর্শন করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের কারণ তাদের তুলে ধরা দরকার এবং একমাত্র বৃহত্তর জনস্বার্থেই তাদের তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৬) **সততা** (Honesty): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের তাদের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় প্রকাশ করা আবশ্যক। তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিষয়গুলো এমনভাবে নিরসন করা দরকার, যাতে জনস্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

(৭) **নেতৃত্ব** (Leadership): জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের এইসব প্রিন্সিপলস সমর্থন ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদর্শন ও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা আবশ্যক।

---

[1] "Standards in Public Life: The Funding of Political Parties in the United Kingdom," Fifth Report of the Committee on Stadards in Public Life, Vo. 1: Report Cm 4057-I, The Stationery Office, October 1998.

ভারতীয় লোকসভার 'কমিটি টু ইনকোয়ার ইনটু মিসকন্ডাক্ট অব মেম্বারস অব লোকসভা'র (Committe to Inquire into Misconduct of Memebers of Lok Sabha) চেয়ারম্যান ভি. কিশোর চন্দ্র এস. ডিও'র ২০০৮ সালের প্রতিবেদনে ভারতীয় লোকসভার সদস্যদের জন্য আচরণবিধিতে আরও দু'টি প্রিন্সিপলস বা নৈতিকতার মানদন্ড যুক্ত করা হয়, যেগুলো হলো-[২]

(১) **জনস্বার্থ** (Public Interest): সর্বোচ্চ পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা প্রদর্শন, রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন মেনে চলা এবং সর্বদা জনস্বার্থ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে লোকসভার সদস্যগণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে লোকসভার প্রতি জনগনের বিশ্বাস ও আস্থা বহাল রাখবেন ও জোরদার করবেন।

(২) **দায়িত্ব** (Responsibility): লোকসভার সদস্যদের নিশ্চিত করা দরকার যে, তাদের সব সিদ্ধান্ত দায়িত্বশীলতার নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তগুলো যেন অপরিণামদর্শী বা অবহেলাপূর্ণ না হয়। বরং সিদ্ধান্তগুলো যেন গ্রহণ করা হয় এগুলোর সম্ভাব্য ও যুক্তিসঙ্গত পরিণামের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে।

আমাদের সংসদ সদস্যদের আচরণ

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের কিছু মাননীয় গণপরিষদ সদস্যের আচরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। কারো কারো বিরুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানীদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগও উঠে। কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারি করা হয়। ওই নির্দেশের আলোকে ৬ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে ১৬ জন সদস্যকে দুর্নীতির অভিযোগে গণপরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে ২২ সেপ্টেম্বর আরও ১৯ জনের গণপরিষদ সদস্যপদ খারিজ করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে আমাদের সংসদ সদস্যদের নৈতিকতার মানে অবনতি ঘটতে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এর একটি বড় কারণ অপরাধী কর্মকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া, যা একটি 'কালচার অব ইম্পিউনিটি' বা অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতিও, আইন প্রণেতাদের মধ্যে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করেছে।

অনেকে আশা করেছিলেন যে, ১৯৯১ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর সংসদ সদস্যদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে এবং আমরা সততা ও নৈতিকতার নতুন মানদন্ড অর্জন করব। কিন্তু এই আশা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি এবং ১৯৯১ সাল থেকে কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগে কোনোরূপ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনেকের স্মরণ আছে যে, পঞ্চম সংসদে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যতবশত সরকারি দল ও বিরোধী দল একটি তদন্ত কমিটির ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেনি। যে কারণে পুরো বিষয়টিই ধামাচাপা পড়ে যায়।

অপরাধী কর্মকান্ডের জন্য আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয় না, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। অনেকের স্মরণ আছে যে, সাবেক স্পিকার ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার ও প্রয়াত চিফ হুইফ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়ার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিটি তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পায়। তা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সংসদ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করে।

সংসদ সদস্যদের অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, নবম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার শুরুতে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে ১৫ জন সংসদ সদস্য নিজেদের স্বার্থ জড়িত আছে এমন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন (*প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০)। অন্য একটি নগ্ন দৃষ্টান্ত হলো যে, ২০০৯ সালে মিথ্যা হলফনামা দিয়ে ১৮ জন সংসদ সদস্য উত্তরা আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন (প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১০)। মিথ্যা বলা একটি গর্হিত কাজ এবং হলফনামার মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রদান একটি দন্ডণীয় অপরাধ। কিন্তু আমাদের জানামতে এদের কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে আমাদের রাজনীতিতে রাজনৈতিক হয়রানীর অজুহাতে মামলা প্রত্যাহারের একটি ভয়াবহ অপসংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে। গত সরকারের আমলে এমন অজুহাতে দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা প্রায় ছয় সহস্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে সংসদ সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলেও এ অপসংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দলীয় বিবেচনায় সাত হাজারের বেশি মামলা ইতোমধ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আরও মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ বিবেচনাধীন আছে। এ ধরনের মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুধু আইনের শাসনের পরিপন্থীই নয়, এর মাধ্যমে অপরাধ কর্মকান্ডও উৎসাহিত হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের সংসদ সদস্যরা এ ধরনের কালচার অব ইমপিউনিটির সুফল ভোগকারী।

প্রয়োজনীয় আচরণবিধির অভাব এবং অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের অনীহার কারণে আমাদের সংসদ সদস্যদের অনেকেই এখন অনেক নেতিবাচক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন। টিআইবি এ সম্পর্কে গতবছর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।[৩] সারাদেশের ৪২টি

---

[2] "Code of Coduct for Members of Lok Sabha," Report by V. Kishore Chandra S. Deo, Chairman, Committee to Inquire into Misconduct of Members of Lok Sabha, March 2008.

[3] টিআইবি, "নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা," ১৪ অক্টোবর, ২০১২।

জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়, যে আলোচনায় মোট ৬০০ জন আলোচক অংশ নেন। জেলাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ২২০টি আসনের মধ্যে ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনাগুলো পরিচালিত হয় এবং আলোচকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংসদ সদস্যদের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই এবং সম্পূরক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে পুরুষ ১৪১ জন (৯৪.৬%) ও নারী সদস্য ৮ জন (৫.৪%); এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ১৩৬ জন (৯১.৩%) ও বিরোধীদলীয় ১৩ জন (৮.৭%)। সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ২৭ (১৮.১%)।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৫৩.৭ শতাংশ কোন না কোন ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। এদের মধ্যে নারী সংসদ সদস্য ৬ জন, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ১৯ জন এবং বিরোধীদলের ৫ জন সংসদ সদস্য। পক্ষান্তরে দলগত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৯৭ শতাংশ বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত। নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িতদের মধ্যে নারী সদস্য ৭ জন, ২৭ জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সবাই এবং বিরোধীদলের সংসদ সদস্য ১২ জন।

নিম্নে বার-চার্টের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ধরন তুলে ধরা হলোঃ

ব্যাপকহারে সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার একটি বড় কারণ হলো, আমাদের সংসদ সদস্যদের সংসদমুখী না হওয়া। বর্তমান সংসদ সদস্যদের, এমনকি অষ্টম সংসদের অনেকেই তথাকথিত স্থানীয় উন্নয়নের নামে স্থানীয়ভাবে অনেক অপকর্মের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। আর তা করা হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত সংবিধান লজ্ঘন এবং উচ্চ আদালতের রায় অমান্য করে।[4]

নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে অনেক সংসদ সদস্য অনেক দুর্নাম কুড়িয়েছেন। তারা বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন, যার প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়বে বলে অনেকে আশংকা করছেন। তাই নবম সংসদের অনেক সদস্যই আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন বঞ্চিত হবেন বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, *দৈনিক যুগান্তরে* প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক শিরোনাম ছিল 'আওয়ামী লীগের ১৫০ এমপি বাদ পড়ছেন' (২৮ জুন ২০১৩)। সরকার এবং দলের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক জরিপের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। জরিপ থেকে দেখা গেছে যে, এসব এমপি এলাকায় জনবিচ্ছিন্ন, দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে যুক্ত এবং স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীদের সমর্থন হারানো। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভবিষ্যতে এমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি এড়াতে হলে সংসদ সদস্যদের সংযত ও দায়িত্বশীল আচরণ আবশ্যক, আর এই জন্যই প্রয়োজন সংসদ সদস্য আচরণ আইন।

প্রস্তাবিত সংসদ সদস্য আচরণ আইন

আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের সদাচারণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪ জানুয়ারি, ২০১০ জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০' শিরোণামের একটি 'বেসরকারি সদস্যদের বিল' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটিতে ১৫টি ধারা রয়েছে, যেগুলো হলো- ধারা ১ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোণাম; ধারা ২ঃ সংজ্ঞা; ধারা ৩ঃ সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান; ধারা ৪ঃ সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব; ধারা ৫ঃ স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য; ধারা ৬ঃ ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান; ধারা ৭ঃ উপঢৌকন বা সেবা; ধারা ৮ঃ সরকারি সম্পদের ব্যবহার; ধারা ৯ : গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার; ধারা ১০ঃ বাক স্বাধীনতা; ধারা ১১ঃ সংসদ সদস্য বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করা; ধারা ১২ঃ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহিষ্ণুতা; ধারা ১৩ঃ নৈতিক কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ; ধারা ১৪ঃ আইন লজ্ঘনের শাস্তি; ধারা ১৫ঃ নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল।

এক নজরে সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০

সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান (ধারা-৩)

এই বিলের ৩ ধারায় সংসদ সদস্যদের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে সংসদ সদস্যগণ হবেনঃ

১। মানবিকতা ও অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন; ২। দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বে অঙ্গীকারাবদ্ধ; ৩। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী; ৪। বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনার ধারক ও বাহক; ৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী; ৬। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সকল প্রকার সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কার্যকলাপ হতে মুক্ত।

সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব (ধারা-৪)

এই বিলের ৪ ধারায় সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছেঃ (১) সংসদ সদস্যরা কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী চলবেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজে কোনো সুপারিশ করতে পারবেন না। (২) নিজের বা পরিবারের সদস্যরা আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবেন না। (৩) তাঁরা এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না,

[4] *Anwar Hossain Manju Vs. Bangladesh* [16BLT(HCD)2008]

যাতে সংসদীয় দায়িত্ব প্রভাবিত হতে পারে। (৪) সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে আইন প্রণয়ন করা এবং নির্বাহী বিভাগ যথাযথভাবে সে আইন পালন করছে কি না, তা তদারক করা।

স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য (ধারা-৫)

এ ব্যাপারে বিলের ৫ ধারায় বলা হয়েছে:

সংসদ সদস্যগণ নিজের বা অন্যের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে অবৈধ ও অসৎ পথ অবলম্বন করবেন না; সংসদ সদস্যগণ নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, আয় ও সম্পদের উৎস সংক্রান্ত তথ্য সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সংসদ শুরুর প্রথম অধিবেশনের মধ্যে প্রকাশ করবেন; সরকারি বা বেসরকারি খাতে কোনো প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে সুবিধা পেতে ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না; সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতি-নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রভাব বা স্বার্থ অর্জন থেকে বিরত থাকবেন; বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার পথে কোনো প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না; সংসদ সদস্যগণ মানবাধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবেন; সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে দেশ ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুন্নকারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন।

প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য ক্ষমতাধর ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পদের হিসাব প্রতিবছর জনসম্মুখে প্রকাশ করার অঙ্গীকার করে। বস্তুত, এই অঙ্গীকারটি দিনবদলের সনদে দু'বার ব্যক্ত করা হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও তাদের 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেশহারে শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার অঙ্গীকার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো দলই কথা রাখেনি এবং সংসদ সদস্যদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করেনি।

এই বিলের অন্যান্য দিকগুলো হলো-

ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান (ধারা-৬)

জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনে সংসদ সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে প্রাধান্য দিবেন এবং সংসদ সদস্যগণ আর্থিক প্রতিদান বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সংসদ বা এর কোনো কমিটিতে কোনো বিষয় উত্থাপন, কোনো বিল বা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান অথবা প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।

উপঢৌকন বা সেবা (ধারা-৭)

সংসদ সদস্যরা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যমানের উর্ধ্বে কোনো উপঢৌকন বা সেবা গ্রহণ করলে তা নৈতিকতা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপঢৌকন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন। স্বার্থগত দ্বন্দ্বে অথবা সদস্যদের দায়িত্ব পালনে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন ধরনের কোনো উপঢৌকন সদস্যরা অবশ্যই গ্রহণ করবেন না।

সরকারি সম্পদের ব্যবহার (ধারা-৮)

আইন, নীতিমালা ও বিধি অনুসারে সংসদ সদস্যগণ সরকারি সম্পদ এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ কোনো অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে তা ব্যবহার করবেন না।

গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার (ধারা-৯)

সংসদ সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী জনগণকে জানানো যাবে না এমন কোনো গোপনীয় তথ্য অবগত হলে তিনি জ্ঞাতসারে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে অবশ্যই তা ব্যবহার করবেন না।

বাক স্বাধীনতা (ধারা-১০)

সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংবিধান ও কার্যপ্রণালীর বিধান সাপেক্ষে সংসদে বক্তব্য উপস্থাপন ও সার্বিক আচরণে গণতান্ত্রিক, মুক্তবুদ্ধি, সহনশীল ও বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ অভিমতের প্রতিফলন ঘটাবেন।

সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুলপথে চালিত করা (ধারা-১১)

সংসদ সদস্যগণ অবশ্যই জ্ঞাতসারে তাদের বিবৃতি ও বক্তব্যের মাধ্যমে সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করবেন না। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল বক্তব্য দিয়ে থাকেন তবে স্বপ্রণোদিতভাবে যত দ্রুত সম্ভব তা সংসদীয় নথিতে সংশোধন করতে বাধ্য থাকবেন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা (ধারা-১২)

সংসদের পবিত্রতা, সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে সংসদ সদস্যগণ পরমত সহিষ্ণু এবং ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, সংসদ অধিবেশনে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন এবং সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসামূলক বক্তব্য, অযাচিত সমালোচনা বা স্তুতি, কটু বা অশ্লীল ভাষা এবং অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি সচেতনভাবে পরিহার করবেন।

নৈতিকতা কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ (ধারা-১৩)

এই আইনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে সংসদে একটি সংসদীয় নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটির নাম হবে 'নৈতিকতা কমিটি'। এ বিলের ১৩ ধারায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সকল দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে ৯ জন সংসদ সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সংসদের স্পিকার।

- যে কোনো ব্যক্তি কোনো সদস্যের ব্যাপারে কমিটির কাছে অভিযোগ দাখিল করলে কমিটি যুক্তিগ্রাহ্যতার বিচারে সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারবে।
- অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সংসদ সদস্য কমিটির যে কোনো নির্দেশ পালনের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।

আইন লঙ্ঘনের শাস্তি (ধারা-১৪)
এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে এর প্রতিকার সম্পর্কে বিলটির ১৪ ধারায় বলা হয়েছে:
যে কোনো ব্যক্তি বিষয়টি ১৩ ধারায় গঠিত কমিটির গোচরে আনতে পারবেন, অথবা; নৈতিকতা কমিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এটি বিবেচনায় নিতে পারবে; কোন সংসদ সদস্য আইন লঙ্ঘন করলে নৈতিকতা কমিটি যেরূপ বিবেচনা মনে করবে সেরূপ শাস্তি সম্পর্কিত রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করবে।

নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল (ধারা-১৫)
এই কমিটির কার্যকাল সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিলটির ১৫ ধারায় বলা হয়েছে:
কমিটি গঠন হতে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত এ কমিটির কার্যক্রম বলবৎ থাকবে; প্রতি বছর নৈতিকতা কমিটি তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে স্পিকার প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; আচরণবিধি সংশোধনকল্পে কমিটি যে কোনো সময় সংসদে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে, তবে এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

জাতীয় সংসদের 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্য বিল প্রস্তাব কমিটি' প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর ২০১১ সালের মার্চ মাসে সংশোধিত আকারে বিলটি সংসদে পাশের জন্য সুপারিশ করে। সুপারিশে বিলটির ১২ ধারা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত এটি পাশের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

উপসংহার

সংসদ সদস্যগণ 'হাউজ অব দি পিপল' বা মহান জাতীয় সংসদের সদস্য। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। নাগরিকরা তাঁদের কাছে দায়িত্বশীল ও দৃষ্টান্তমূলক আচরণ আশা করেন। এ ছাড়াও সংসদ সদস্যগণ সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে জনগণের কাছে সংসদের এবং নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সংসদের অভ্যন্তরে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান থাকলেও, সংসদের বাইরে তাদের সংযত আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো বিধিবদ্ধ আইন নেই। তাই আমরা বেসরকারি বিল হিসেবে 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' পাশের জোর দাবী জানাই। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সংসদ সদস্যদের জন্য সুস্পষ্ট আচরণবিধি রয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তাদের দিনবদলের সনদে এমন একটি আচরণবিধি প্রণয়নের অঙ্গীকার করে।

আইনটি পাশের ক্ষেত্রে আমরা প্রস্তাবিত বিলের ১২ ধারাটি পুনঃস্থাপনের দাবী জানাই। একইসঙ্গে দাবী জানাই, মাননীয় সংসদ সদস্যদের কার্যপরিধি সংসদীয় কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার। বিশেষত তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে উপদেষ্টার ভূমিকা ও হস্তক্ষেপের অবসান আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে জরুরি হয়ে পড়েছে বৈষম্যমূলকভাবে তাদের শুল্কমুক্ত গাড়ী আমদানী ও আবাসিক এলাকায় প্লট প্রাপ্তির সুযোগের অবসানের। আরও জরুরি হয়ে পড়েছে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির ইতি টানার। সংসদ সদস্য আচরণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে আমরা সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানও ১৪ ধারায় অন্তর্ভুক্তির দাবী জানাই।

[জাতীয় সংসদে উত্থাপনীয়]

বিল নং - ০৫

সংসদ সদস্যগণের আচরণ নির্ধারণকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যগণের আচরণ নির্ধারণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ-** এই আইন সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কার্যপ্রণালী বিধি" অর্থ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি,

(খ) "জাতীয় সংসদ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জাতীয় সংসদ,

(গ) "নৈতিকতা কমিটি" অর্থ এই আইনের ১৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কমিটি,

(ঘ) "মন্ত্রী" অর্থ মন্ত্রী সভার কোন সদস্য, এবং "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীগণ ও উপমন্ত্রীগণ অন্তর্ভূক্ত,

(ঙ) "সংসদ সদস্য" অর্থ জাতীয় সংসদের কোন সদস্যকে বোঝাইবে।

৩। **সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান।-** প্রত্যেক সংসদ সদস্য নিম্নরূপ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) মানবিকতা ও অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন,

(খ) দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বে অঙ্গীকারাবদ্ধ,

(গ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী,

(ঘ) বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক চিন্তা ভাবনার ধারক ও বাহক,

(ঙ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী,

(চ) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সকল প্রকার সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কার্যকলাপ হইতে মুক্ত।

৪। **সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব, ইত্যাদি ঃ-** (১) সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব হইবে-

(ক) সংসদ সদস্যগণ সংসদের ভেতরে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবেন।

এক্ষেত্রে

(অ) দায়বদ্ধতার সাথে জনগণের প্রতিনিধিত্ব,

(আ) আইন প্রণয়ন, এবং

(ই) সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা- এই তিনটি ভূমিকা সক্রিয়ভাবে পালন করিবেন,

(খ) নির্বাচিত হইয়া শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ তাঁহাদের উপর জনগণের স্থাপিত আস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সর্বক্ষেত্রে আইনকে সমুন্নত রাখিবেন,

(গ) সার্বিকভাবে জাতীয় স্বার্থে কাজ করিবার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সক্রিয় থাকিবেন,

(ঘ) ব্যক্তিগত এবং আর্থিক লাভের বিষয়টিকে বিবেচনায় না লইয়া সংসদ সদস্যগণ সবসময় বস্তুনিষ্ঠভাবে সংসদীয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সংসদ সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালনকালে নিম্নলিখিত সাধারণ আচরণের মূলনীতি অবশ্যই অনুসরণ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) সংসদ সদস্যগণ দায়িত্ব পালনকালে তাঁহাদের দায়িত্বের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কিত থাকিলে তাহা প্রকাশ করিবেন এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন,

(খ) সংসদ সদস্যগণ তাঁহাদের গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্বচ্ছতা অবলম্বন করিবেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথাযথ কারণসমূহ তাঁহারা উপস্থাপন করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে শুধুমাত্র জনস্বার্থের ক্ষেত্রে তথ্যকে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিবেন,

(গ) সংসদ সদস্যগণ তাঁহাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করিবেন এবং অবশ্যই তাঁহারা যে কোন ধরনের যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন,

(ঘ) সংসদ সদস্যগণ শুধুমাত্র জনস্বার্থকে বিবেচনায় রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এসব ক্ষেত্রে নিজেদের, তাঁহাদের পরিবার অথবা স্বজনদের কোনো ধরনের আর্থিক অথবা বস্তুগত সুবিধা লাভের জন্য তাঁরা এমন কিছু করবেন না,

(ঙ) সংসদ সদস্যরা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে এমনভাবে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো বাধ্যবাধকতায় সম্পৃক্ত হবেন না যা তাঁদের সংসদীয় দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করতে পারে,

(চ) সংসদ সদস্যরা তাঁহাদের দায়িত্ব পালনকালে নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন অথবা কোনো ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান এবং কোনো ধরনের সুবিধা প্রদানে সুপারিশসহ যে কোনো ধরনের কাজে মেধা ও যোগ্যতাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিবেন,

(ছ) সংসদ সদস্যরা অবশ্যই নেতৃত্ব গুণে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে এই নীতিসমূহের প্রসার ঘটাবেন।

৫। **স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য ঃ-** প্রত্যেক সংসদ সদস্য স্বার্থগত ও আর্থিক বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) সংসদ সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের বা অন্যের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে জ্ঞাতসারে কোনো কার্য সম্পাদনে অবৈধ এবং অসৎ পথ অবলম্বন করবেন না,

(খ) স্বার্থগত দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সদস্যরা স্বয়ং দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এ ধরনের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এড়ানোর লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের সংসদীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন এবং সেই আলোকে ব্যক্তিগত বিষয় ও জীবনাচারকে বিন্যস্ত করবেন,

(গ) কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে যে কোনো ধরনের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রকাশে সংসদ সদস্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার দ্বিধা সৃষ্টি বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নৈতিকতা কমিটির শরণাপন্ন হয়ে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন,

(ঘ) সংসদ সদস্যরা নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, আয় ও সম্পদের উৎস সংক্রান্ত তথ্য সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সংসদ শুরুর প্রথম অধিবেশনেন মধ্যে প্রকাশ করবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর নবায়ন করবেন। এ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে বর্ণিত নৈতিকতা কমিটি যাচাই-বাছাই করে জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন,

(ঙ) কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে প্রকাশ ব্যতিরেকে সংসদ সদস্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন না,

(চ) সরকারি বা বেসরকারি খাতে কোনো প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে সুবিধা পেতে সদস্যরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুপারিশ বা অন্যান্য হস্তক্ষেপ অথবা স্বীকৃত পদ্ধতির পরিবর্তন করবেন না,

(ছ) সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যরা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রভাব বিস্তার বা স্বার্থ অর্জন থেকে বিরত থাকবেন,

(জ) বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করা হইতে বিরত থাকিবেন,

(ঝ) সংসদ সদস্যগণ মানবাধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হইবেন। একই সাথে শিশু অধিকার, সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়ন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবেন,

(ঞ) সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে দেশ ও দেশের বাইরে এমন সকল কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিবেন যাহার মাধ্যমে স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

৬। **ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান ঃ-** জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনে সংসদ সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে প্রাধান্য দিবেন এবং সংসদ সদস্যগণ আর্থিক প্রতিদান বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সংসদ বা এর কোনো কমিটিতে কোনো বিষয় উত্থাপন, কোনো বিল বা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান অথবা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।

৭। **উপঢৌকন বা সেবা ঃ-** সংসদ সদস্যরা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যমানের ঊর্ধ্বে কোনো উপঢৌকন বা সেবা গ্রহণ করলে তা নৈতিকতা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপঢৌকন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্বে অথবা সদস্যদের দায়িত্বপালনে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন ধরনের কোনো উপঢৌকন সদস্যরা অবশ্যই গ্রহণ করবেন না।

৮। **সরকারি সম্পদের ব্যবহার ঃ-** আইন, নীতিমালা ও বিধি অনুসারে সংসদ সদস্যগণ সরকারি সম্পদ এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ কোনো অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন না।

৯। **গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার ঃ-** সংসদ সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী জনগণকে জানানো যাবে না এমন কোনো গোপনীয় তথ্য অবগত হলে তিনি জ্ঞাতসারে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে অবশ্যই তা ব্যবহার করবেন না।

১০। **বাক স্বাধীনতা ঃ-** সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংবিধান ও কার্যপ্রণালীর বিধান সাপেক্ষে সংসদে বক্তব্য উপস্থাপন ও সার্বিক আচরণে গণতান্ত্রিক, মুক্তবুদ্ধি, সহনশীল, বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ অভিমতের প্রতিফলন ঘটাইবেন।

১১। **সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করা ঃ-** সংসদ সদস্যগণ অবশ্যই জ্ঞাতসারে তাদের বিবৃতি ও বক্তব্যের মাধ্যমে সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করবেন না। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল বক্তব্য দিয়ে থাকেন তবে স্বতোপ্রণোদিতভাবে যত দ্রুত সম্ভব তা সংসদীয় নথিতে সংশোধন করতে বাধ্য থাকবেন।

১২। **পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা ঃ-** সংসদের পবিত্রতা, সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে সংসদ সদস্যগণ পরমতসহিষ্ণু হইবেন এবং ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, সংসদ অধিবেশনে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন এবং সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসামূলক বক্তব্য, অযাচিত সমালোচনা বা স্তুতি, কটু বা অশ্লীল ভাষা এবং অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি সচেতনভাবে পরিহার করবেন।

১৩। **নৈতিকতা কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ, ইত্যাগি ঃ-** (১) এই আচরণ বিধি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করিতে সংসদে একটি সংসদীয় নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে, যার নাম হবে "নৈতিকতা কমিটি"।

(২) এই কমিটি স্পিকারের নেতৃত্বে অনধিক ৯ জন সংসদ সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) সংসদের প্রথম অধিবেশনের মধ্যে সংসদে প্রতিনিধিকারী সকল দলের সদস্যবৃন্দের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) এই কমিটি প্রতি ১ (এক) মাস অন্তর একবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

(৫) কোনো সদস্যের আচরণ বা কর্মকাণ্ড আচরণ আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হইলে যে কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে নৈতিকতা কমিটির কাছে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(৬) টেলিভিশনের বা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত উত্থাপিত অভিযোগ নৈতিকতা কমিটি আমলে নিতে পারিবেন।

(৭) প্রাথমিকভাবে অভিযোগের স্বপক্ষে যদি যথেষ্ট যুক্তিপ্রমাণ আছে বলে কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়, তাহলে কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে কারণ দর্শানো নোটিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারবে এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে অভিযোগটি ভিত্তিহীন মনে হলে, সেখানেই এর নিষ্পত্তি করা হবে। আর যদি ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে পরবর্তী প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নৈতিকতা কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সহ বিষয়টি সংসদে উপস্থাপন করবে।

(৮) অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সংসদ সদস্য কমিটির যে কোন নির্দেশ পালনের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করিবেন।

১৪। **আইন লংঘনের শাস্তি।-** (১) এই আইনের কোন বিধান কোন সংসদ সদস্য লংঘন করিলে-

(ক) যে কোন ব্যক্তি বিষয়টি ধারা ১৬-এ গঠিত কমিটির গোচরের আসিতে পারিবেন, অথবা

(খ) নৈতিকা কমিটি স্বয়ং বিবেচনায় নিতে পারিবেন।

(২) কোন সংসদ সদস্য আইন লংঘন করিলে নৈতিকতা কমিটি যেরূপ বিবেচনা মনে করিবেন সেইরূপ শাস্তি সম্পর্কিত রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করিবেন।

১৫। **নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল, ইত্যাদি।-** (১) কমিটি গঠন হইতে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত এ কমিটির কার্যক্রম বলবঃ থাকিবে,

(২) কমিটি প্রতি বছর নৈতিকতা কমিটি উহার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করিবেন। এক্ষেত্রে স্পিকার প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও জনসমপেক্ষ প্রকাশ করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন,

(৩) আচরণ বিধি সংশোধনকল্পে কমিটি যেকোন সময় সংসদে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে, তবে এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃত

বাংলাদেশের সংবিধানানুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" (অনুচ্ছেদঃ ৭) জনগণের পক্ষে সংসদ সদস্যগণই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেহেতু জনগণের রায়ে নির্বাচিত হইয়া জনগণের পক্ষে সংবিধানানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাঁহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেহেতু তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ সংসদ সদস্যগণের মধ্যে তাহাদের আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখিতে চায়। আর তাই সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ ও সামগ্রিক আচরণ একটি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।

একটি রাষ্ট্রের কোনো সংসদ সদস্যের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের প্রতিফল ভোগ করিতে হয় সেই দেশের জনগণকে। এর ফলে সৃষ্টি হয় নানাবিধ জটিলতা, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে দেখা দেয় অস্থিরতা। এ ধরনের আচরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হইবার আশংকাও থাকিয়া যায়। এ রকম অসংখ্য নজির বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংসদীয় ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মানুষের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সংসদ সদস্যগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাইতে হইবে। মানবিক গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী সমাজ গড়িয়া তুলিতে সংসদ সদস্যগণের ইতিবাচক ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই।

সংসদ সদস্যগণ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকিয়া যাহাতে তাঁহাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচরণে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম হন, সেই লক্ষ্যে এ বিল প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সাবের হোসেন চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
নির্বাচনী এলাকা ১৮২, ঢাকা-৯।